সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) -এর মুখপত্র

১৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০২৬ | website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org | মূল্য ৫ টাকা

সংসদ ভবনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ

বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা গত ৬ জুলাই এক বিবৃতিতে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন "জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন। আমরা পূর্বে কখনও এরকম ঘটনা ঘটতে দেখিনি। আবার এই উদাহরণ সৃষ্টি করা হলো এমন একটি দেশকে দিয়ে যে অতীতে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, আর বর্তমানে নানা ধরনের অপমানজনক চুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। একইসাথে এটি সেই দেশ- যে দেশ গোটা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে।

ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়াসহ দেশে দেশে গণহত্যা পরিচালনাকারী সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা তার স্বার্থে যে কোন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করতে পারে। বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিনদিন আগে আমেরিকার সাথে অসম, অধীনতামূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে- যা দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। নির্বাচিত বিএনপি সরকার সে চুক্তি বাতিল না করে উল্টো মার্কিন তোষণ নীতিতে চলছে। বিরোধী দল জামাত-এনসিপিও এই চুক্তির বিরোধীতা করেনি শুধু নয়, রাজনৈতিক স্বার্থে নানাভাবে তারা আমেরিকাকে তোষামোদ করে চলছে। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অনুমতি এবং সরকার ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ সেই নতজানু মার্কিন তোষণ নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।"

গণঅভ্যুত্থানের দুই বছরঃ

কেন অপূর্ণ রয়ে গেল জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা

জুলাই অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এরইমধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। দুই বছরে পা দেয়া এবারের জুলাই তাই শুধু শহিদের শোক, আন্দোলনের বিজয় আর পতিত ফ্যাসিস্টদের নৃশংসতার স্মৃতিচারণ নয়– এবারের জুলাই অনেক কিছুর উত্তর খোঁজায়ও ব্যস্ত। এতে জুলাইয়ের আবেগ যেমন আছে, তেমনি আছে জুলাইয়ের হিসাব-নিকাশও।

ছবি সূত্রঃ ইন্টারনেট

জুলাই শুরু হয়েছিল কোটা সংস্কারের আন্দোলন দিয়ে, শেষ হয়েছে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তার ফলাফল এই গণঅভ্যুত্থান। এই গণঅভ্যুত্থানে আমাদের দল একেবারে সামনের সারিতে থেকে লড়েছে। গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়াইয়ে ছিলাম। নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ জনজীবনের সংকট নিয়ে আমরা ধারাবাহিক আন্দোলন করেছি, আক্রমণের স্বীকার হয়েছি। এর ধারাবাহিকতায় যখন গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়, তখন আমরা সর্বশক্তি নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করি। সমস্ত বামপন্থী দল সর্বশক্তি নিয়ে গণঅভ্যুত্থানে সেদিন অংশগ্রহণ করলে এই গণঅভ্যুত্থানের চরিত্র ও পরিণতি ভিন্ন হতো।

অভ্যুত্থান হয়েছে, আওয়ামী লীগ বিদায় নিয়েছে। প্রকাণ্ড সে বিস্ফোরণে আওয়ামী লীগ শুধু ক্ষমতাচ্যুতই হয়নি, দলের তৃণমূলের অনেক নেতাকর্মীরা পর্যন্ত দেশত্যাগ করেছেন, কিংবা এলাকাছাড়া হয়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে আছেন। ইতিহাসে এ এক দুর্লভ ঘটনা। কতটা জনবিরোধী হলে একটা দলের পরিণতি এমন হতে পারে!

আওয়ামী লীগের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তারা দেড় বছর ক্ষমতায় ছিল। এর মধ্যে একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। নতুন সরকার প্রায় পাঁচ মাসে পা দিচ্ছে। প্রায় দুই বছরের এই সফরের গতিমুখ কি অভ্যুত্থানে ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার পক্ষে যায়?

অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন নানা দলের, নানা মতের, নানা চিন্তার। কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, বরং দলীয় রাজনৈতিক ভাষ্য দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়ার আওয়ামী কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিল এই অভ্যুত্থান। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দলীয় ইতিহাসকে একমাত্র ইতিহাসে পরিণত করা ও বাকি সকল আলোচনা-সমালোচনাকে বলপূর্বক দমন করা ছিল আওয়ামী লীগের রাজনীতি। আওয়ামী লীগ ব্যাপারটা একরম দাঁড় করিয়েছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করা। স্বাভাবিকভাবেই এর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া সমাজে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা নয়, মুক্তিযুদ্ধকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ তার অন্যায়কে যুক্তিসঙ্গত করতে চাচ্ছিল– এটা ছিল তার বিরোধীতা।

অথচ গণঅভ্যুত্থানের ঠিক পর থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানকে দাঁড় করানোর একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। জামায়াতে ইসলামী গণঅভ্যুত্থানকে তাদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীতার ইতিহাস ও দায় গা থেকে ঝেড়ে ফেলার সুযোগ হিসেবে নেয়। ফলে তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত ও প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও দেখা গেল তারাও সে কাজে নামলেন। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান হতে গেলে বর্তমান সংবিধানে কী কী পরিবর্তন করতে হবে– সেটা ঠিক করাই ছিল সরকারের গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের দায়িত্ব। অথচ তারা তাদের খসড়া প্রতিবেদনে এদেশের এক দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করলেন। কিন্তু এই ইতিহাসে বাস্তবে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তথা জাতি গঠনের ভ্রান্ত ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনাগত দিক সম্পর্কে নতুন এক বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো,

● এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর
প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

৬ জুলাই ছিল বাসদ (মার্কসবাদী)' এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন সকালে দলীয় কার্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও নির্বাহী ফোরামের সদস্য রাশেদ শাহরিয়ার। এসময় দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধাঃ ১১ জুলাই ২০২৬ কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে পার্টির গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে স্মরণসভার আয়োজন করা হয় পাবলিক লাইব্রেরি হল রুমে। স্মরণসভায় জেলার আহ্বায়ক কমরেড আহসানুল হাবিব সাঈদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু ও নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, জেলা কমিটির সদস্য গোলাম ছাদেক লেবু, পরমানন্দ দাস, রাহেলা সিদ্দিকা প্রমুখ।

জুলাই গণহত্যাঃ বিচার কোন পথে

২০২৪ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে চলা আওয়ামী ফ্যাসিস্ট শাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, দুর্নীতি, দমন-পীড়ন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দলীয়করণের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ সেই সময়ে বিস্ফোরিত রূপ লাভ করে। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন দ্রুতই সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী, নারী, তরুণসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এতে যুক্ত হন।

সমস্ত স্বৈরাচারী শাসকের মতোই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারও জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরিবর্তে দমন-পীড়নের পথ বেছে নেয়। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করা হয়। গুলি, গ্রেপ্তার, নির্যাতন এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু জনগণের প্রতিরোধকে থামানো যায়নি। বরং সেই দমন-পীড়ন আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করেছে।

মাত্র মাসাধিক সময়ের ব্যবধানে দেড় সহস্রাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। অনেকেই স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। কেউ পা হারিয়েছেন, কেউ চোখের আলো হারিয়েছেন। অসংখ্য পরিবার তাদের স্বজন হারিয়েছে। অসংখ্য মানুষ আজও শারীরিক ও মানসিক ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস অসীম আত্মত্যাগ, সাহস, বেদনা এবং সংগ্রামের ইতিহাস।

● এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

বিদ্যুৎ গতিতে বাড়ছে বিদ্যুতের দাম

দেড় মাসের ব্যবধানে দুই দফায় জ্বালানি তেল এবং এলপিজি গ্যাসের দাম বৃদ্ধির পর সম্প্রতি বাজেটের আগেই চটজলদি বাড়ানো হলো বিদ্যুতের দাম। পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ১৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ, গ্রাহক পর্যায়ে খুচরা বিদ্যুতের দাম গড়ে ১৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ এবং সঞ্চালন চার্জ ২৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এমনিতেই জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর প্রভাবে পরিবহন খরচসহ নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। মূল্যস্ফীতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় যখন সর্বোচ্চ অবস্থান বাংলাদেশের (বর্তমানে ৯ শতাংশের অধিক) ঠিক তখনই বিশ্লেষকেরা আশঙ্কা করছেন সাম্প্রতিক বিদ্যুতের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে পণ্য ও সেবার দাম আরেক দফা বৃদ্ধি পাবে। যদিও নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের পরপর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই বছরের

● এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

কেন অপূর্ণ রয়ে গেল জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা

● ১ম পৃষ্ঠার পর

যা ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক। ইতিহাস বিকৃতির এই প্রচেষ্টা সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ছাড়াও আমরা দেখেছি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রস্তাবিত জুলাই ঘোষণায় ও সরকার প্রস্তাবিত জুলাই ঘোষণায়। এছাড়া বিভিন্ন মিডিয়ায়, প্রচারযন্ত্রে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, টক শোতে– এই প্রচার দুরন্ত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলাফল হয় এই যে, দেশের বিরাট অংশের মানুষ, যারা মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করেন ও গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা রেখেছেন– তারা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সংস্কারকে উপলক্ষ্য করে যখন ইতিহাসকে পাল্টানোর চেষ্টা করা হয়, কিংবা একটা ভুল ইতিহাসের বদলে আরেকটা ভুল ইতিহাসকে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়– তখন সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই সন্দেহ তৈরি হয়। সেটা হয়েছেও।

কিন্তু একথা সত্য যে, এটা বিপ্লব ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার কোনো এজেন্ডাই এই অভ্যুত্থানে ছিল না। এজন্যই এটা ছিল গণঅভ্যুত্থান। যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো আওয়ামী লীগ সরকার নির্মমভাবে হরণ করেছিল, যার জন্য মানুষের চাপা ক্ষুব্ধতা বিস্ফোরিত গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিল– সেই অধিকারগুলো জনগণকে ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজ। অথচ সরকার সেই পথে না হেঁটে ইতিহাস পরিবর্তনের দিকে গেলেন, এতে গণঅভ্যুত্থানের ঐক্যই নষ্ট হলো।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও কৃষক শ্রমিকদের মুক্তির ১১ দফা দাবিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের গণপরিষদ নির্বাচন - এগুলো ছিল পাকিস্তানের প্রায় উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও নতুন জাতি হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ছিল এই গণআন্দোলনগুলোর স্বাভাবিক পরিণতি। আবার এই জাতি গঠনের কালপর্বে মওলানা ভাসানীর ছিল আপোষহীন ভূমিকা।

ইতিহাস থেকে এই অধ্যায়গুলো বাদ দেওয়ার অর্থ হলো ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো এবং বাংলাদেশের জাতি গঠনের ইতিহাসকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা। আমরা দলের পক্ষ থেকে বারবার এ বিষয়ে কথা বলেছি। লিখিত বক্তব্য উত্থাপন করেছি সরকারের সাথে বৈঠকে ও ঐকমত্য কমিশনের সভায়।

২.

আওয়ামী লীগের আমলে কয়েকটি বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে দেশের সকল সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছিল। এরা পেছন থেকে সুবিধা নিচ্ছিলেন, বিষয়টা এমন নয়। এদের খোলামেলা প্রভাব প্রদর্শনের কারণে তাদের নাম ও পরিচয় পর্যন্ত জনগণ জানতো। দেশের অর্থনীতি খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ফলে জনগণ অর্থনীতিতে কতিপয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আধিপত্যের অবসান চাইছিল।

দ্রব্যমূল্যে ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষ ছিল দিশেহারা। সিন্ডিকেট করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়ানো হতো। চাঁদাবাজির কারণে দাম বাড়তো। নিরন্ন মানুষের, দরিদ্র মানুষের এবং সর্বশেষে মধ্যবিত্ত মানুষের লাইন দীর্ঘ হচ্ছিল টিসিবি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রাকের সামনে। মানুষ এ থেকে রেহাই চাইছিল।

অভ্যুত্থানের পরেও এর কোন ব্যত্যয় ঘটলো না। কারণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি সরকারের পতন হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে যায়নি। বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী– এসবের প্রভাব, তাদের শ্রেণিগত কর্তৃত্ব একইরকম রয়ে গিয়েছিল। এই গোষ্ঠী বর্তমান সংসদে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর পেছনে অঢেল অর্থ ব্যয় করছে। বৃহৎ পুঁজিপতিরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পর্যন্ত হয়েছেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি যুক্ত হয়েছেন। বিএনপি ক্ষমতায় এসে সকল নিয়ম ডিঙিয়ে এক ব্যবসায়ীকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ দিয়েছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য একটি কমিটি হয়েছিল। তাদের শ্বেতপত্র এবং তাদের সুপারিশ– সবই বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে।

এই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট এখনও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক গ্রুপের প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়ে কী করা যায়– সেটা ঠিক করতে প্রায় সকল বড় ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আলোচনায় বসেছেন, রাস্তা ঠিক করছেন। ফলে অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দ্রব্যমূল্য কমেনি, মুদ্রাস্ফীতি কমেনি– বরং ক্ষেত্রবিশেষে অভ্যুত্থানের আগের চেয়ে বেড়েছে।

৩.

সরকারি অফিসসহ সকল ক্ষেত্রে ঘুষ, দুর্নীতির কারণে মানুষ প্রায় অসহায় হয়ে পড়েছিল। কোথাও কোন ন্যায়বিচার ছিল না। কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা ছিল না। সাধারণের কোন ঠাঁই সে সকল জায়গায় ছিল না। সাধারণ মানুষ সামান্য সরকারি সেবা পাওয়ার জন্য হয়রানির শিকার হতো। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতির কোন বিচারও হতো না।

এটা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছিলেন, তারাও দুর্নীতি কমাতে পারেনি। টিআইবি-এর জরিপ অনুযায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম বছরে দেশের সেবা খাতে দুর্নীতির গভীরতা ও ব্যাপ্তি বিগত ২০২৩ সালের (আওয়ামী লীগ আমলের) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা গেছে, দেশের ৮১.৬ শতাংশ পরিবার কোনো না কোনো সরকারি বা আধা-সরকারি খাতে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। ২০২৩ সালে এই হার ছিল ৭০.৯ শতাংশ। অর্থাৎ সেবা খাতে সামগ্রিক দুর্নীতি প্রায় ১৫.১% বেড়েছে। এই এক বছরে দেশজুড়ে মোট ১২,৬৩৩.২ কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হয়েছে। এই বিশাল অর্থ দেশের জাতীয় বাজেটের ১.৫৮ শতাংশ এবং মোট জিডিপির প্রায় ০.২৩ শতাংশের সমান। ২০২৩ সালের তুলনায় ঘুষের এই মোট লেনদেন ১৫.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।

টিআইবি-এর তথ্যমতে, নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে তাদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশি অনুপাতে ঘুষ দিতে হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সেবা পেতে অনেক দরিদ্র পরিবারকে তাদের মাসিক আয়ের প্রায় ৩৪ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষের পেছনে খরচ করতে হয়েছে।

এই পরিস্থিতি কি কাম্য ছিল? কিন্তু এটা ঘটেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভ্যুত্থানের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছাত্ররা চাঁদাবাজি করেছেন, সরকারি টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে গেছেন, সরকারি পদ বাগিয়েছেন, ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়েছেন– এ সবকিছু অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রত্যাশাকে ধ্বংস করেছে।

৪.

ভয়াবহ দমন-পীড়ন-নির্যাতন ও খুন-গুমের মধ্য দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী একটি সরকারি সন্ত্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। রাতের আঁধারে, এমনকি দিনের বেলায় কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়া, পরে অস্বীকার করা, 'আয়নাঘর'-এর মতো গোপন কারাগার তৈরি করে সেখানে বছরের পর বছর বন্দীদের আটক করে রাখা ও নির্যাতন করা– সবমিলিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে এক বিভীষিকার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বোচ্চ ভয়াবহ রূপ দেখা যায় গণঅভ্যুত্থানের সময়, যখন তারা আন্দোলনকারীদের পাখির মতো গুলি করে মেরেছে। পুলিশ যাতে অত্যাচারী শাসকের রক্ষাকর্তা না হয়ে, জনগণের সাহায্যকারী হয়– পুলিশের সেই ভূমিকাই জনগণ চেয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে পুলিশ সংস্কারের দাবি উঠেছিল ব্যাপকভাবে।

অভ্যুত্থানের পর মিথ্যা মামলা, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার ও গ্রেফতার বাণিজ্য এমন জায়গায় উঠেছিল যে, খোদ আইনমন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এই ঘরনের ব্যাপকভাবে ঘটনা ঘটছে ও তা বন্ধ করা দরকার। এটা বন্ধ হয়নি, বরং বিভিন্ন জায়গায় বর্তমান সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা সকল দলই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা নিয়ে কোন আলোচনা ঐকমত্য কমিশনে হয়নি। সেখানে সর্বসম্মতভাবে কেবল পুলিশ কমিশন গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এই কমিশন গঠন ও এখন অনিশ্চিত।

৫.

ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করেছে উদারভাবে। বাস্তবে দেশি ও বিদেশি কর্পোরেটদের সেবাদাস ছিল আওয়ামী লীগ সরকার। এরমধ্যে ভারতের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারত আমাদের অভ্যন্তরীণ অনেক বিষয়ে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, সেটা নজিরবিহীন। গণঅভ্যুত্থানকারী জনগণ চেয়েছিল আমাদের দেশে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত একটি দেশপ্রেমিক সরকার গঠিত হবে।

অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে সে আকাঙ্ক্ষা চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়েছে। এর সবচেয়ে ঘনীভূত প্রকাশ হলো– জাতীয় নির্বাচনের ৩ দিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি। নতুন সরকার ও সংসদ গঠিত হওয়ার পরও সংসদে এ নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। সংস্কারের ব্যাপারে সবসময় সোচ্চার জামায়াত-এনসিপিও এ ব্যাপারে কোন শব্দ উচ্চারণ করেনি। অথচ সংবিধান সংস্কার কমিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ছিল এই যে, আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো সংসদে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।

অথচ তারা কেউ-ই এই আলোচনা চাইলেন না। স্বতন্ত্র সাংসদ রুমিন ফারহানা এ ব্যাপারে কথা তুললেন। কিন্তু এটা সংসদে আলোচনার বিষয় হলো না, আর একজন সদস্যও এ বিষয়ে কথা তুললেন না। এই চুক্তির ফলাফলে প্রায় ৪ বিলিয়ন টাকা খরচ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোয়িং কিনেছে সরকার। টনপ্রতি ২৪ ডলার বেশি খরচ করে ইতোমধ্যে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন গম কিনছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ সবই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির কারণে। সরকারি তহবিলের এতগুলো টাকা ব্যয় শুধু নয়, দেশের কৃষি ও শিল্পখাত ধ্বংস হতে যাচ্ছে যে চুক্তির মধ্য দিয়ে, সেটা নিয়ে সংসদে বিন্দুমাত্র আলোচনা নেই। বরং সংসদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ক 'ককাস' গঠন করা হয়েছে, যার সদস্য হয়েছেন বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সাংসদরা। বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি খবরদারি এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে একদল লোক মনে করতে লাগলেন– দেশে ইসলামী বিপ্লব কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। তারা অন্য ধর্মের অনুসারী, মাজার ও সুফি ঘরানার অনুসারী এবং নারীদের উপর খড়গহস্ত হলেন। Maqam: Center for Sufi Heritage-এর ২০২৬ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সূত্রে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মাজারে মোট হামলার সংখ্যা ১০০টি ছাড়িয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ এবং উগ্রপন্থী দলগুলোর বাধার কারণে এই সময়কালে বেশ কয়েকটি মাজারে ঐতিহ্যবাহী উরস উৎসব ও জমায়েত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ৬৭টি মাজার হামলার ঘটনার মধ্যে ৬১ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনো মামলাই হয়নি। এর আগে মাজারের কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে মারার ঘটনাও ঘটেছে, হামলা করে মাজারের পীরকে হত্যা করা হয়েছে, মাজারের টাকা ও স্বর্ণ লুট করা হয়েছে। এসকল হামলায় গ্রেফতার না করা, পদক্ষেপ না নেয়া, প্রশাসন নিজে হস্তক্ষেপ করে উরস বন্ধ করে দেয়া, প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে এগুলোকে অনৈসলামিক চর্চা হিসেবে আখ্যায়িত করা– ইত্যাদি কারণে এই মানুষের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক বেড়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সাম্প্রদায়িক শক্তির দৃশ্যমান তৎপরতা অনেকের নজরে এসেছে। উগ্র সাম্প্রদায়িক চিন্তার যে রূপ চারপাশে দেখা যাচ্ছে, তাতে দেশেরগণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের একটা অংশ আতঙ্কিত হচ্ছেন এবং অভ্যুত্থানের কারণেই এমনটি ঘটছে মনে করছেন। তাদের এটা বোঝা উচিত যে, সাম্প্রদায়িকতা গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল নয়। অভ্যুত্থানের পর সৃষ্ট রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের পরিসরে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো নিজেদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের নমনীয় আচরণেরও সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু তাদের প্রভাব ও বিস্তার ৫ আগস্টের পর হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। আওয়ামী লীগ তার ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম রাখার স্বার্থেই মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আবার মৌলবাদের উত্থানের ভয় দেখিয়ে উদার ও গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন মানুষের সমর্থন আদায় করতে চেয়েছে। এর বিষময় ফলাফল আমরা এখন দেখছি। এটা গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল নয়, এটা ফ্যাসিবাদী শাসনের ফলাফল।

দীর্ঘদিন ধরে দেশের শাসকগোষ্ঠীর দলগুলো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম গড়ে তোলার পরিবর্তে কখনও দমন-পীড়ন, কখনও আপস, আবার কখনও নির্বাচনী সমীকরণের অংশ হিসেবে এসব শক্তিকে ব্যবহার করেছে। ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে নানা রূপে টিকে থেকেছে এবং বিস্তার লাভ করেছে। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানও এদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে পুষ্টি জুগিয়েছে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, রাজনৈতিক বিরোধিতার ক্ষেত্র সংকুচিত করা এবং জনগণের প্রকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান না হওয়ায় সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো নিজেদের বিকল্প হিসেবে হাজির করার সুযোগ পেয়েছে।

সুতরাং গণ-অভ্যুত্থানের পর সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা হিসেবে নয়, বরং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আপস, আদর্শিক শূন্যতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কার্যকর গণআন্দোলনের অভাবের ফলাফল হিসেবে দেখা প্রয়োজন।

অভ্যুত্থানের পর শ্রমজীবীদের উপর রাষ্ট্রীয় জুলুম সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা

সরকারের পক্ষ থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ৮৪৪ জন শহিদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এরমধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৮৪ জন। এরপর ছাত্রদের সংখ্যা ২৬৯ জন। এরপর সবচেয়ে বেশি প্রাণ দিয়েছে ছোট ব্যবসায়ী অর্থাৎ যারা ফুটপাতের, রাস্তার পাশের কিংবা গলির ভেতরের ছোট দোকানদার। গণঅভ্যুত্থানের পর এদের উপরেই সবচেয়ে বড় আক্রমণ নেমে আসে। গণঅভ্যুত্থানের পর শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির জন্য রাস্তায় নামতে হয়েছে, তাদের উপর গুলি হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে প্রথম নিহত হলেন একজন শ্রমিক। নিহত হলেন ন্যায্য মজুরি চাইতে গিয়ে। এরপর আমরা দেখেছি রমজান মাসেও বকেয়া মজুরির জন্য গার্মেন্টস শ্রমিকদের দিনের পর দিন শ্রম ভবনের সামনে বসে থাকতে হয়েছে, তাও পুরো বেতন তারা পাননি। ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামায় তাদের উপর হামলা হয়েছে। হামলা হয়েছে আদিবাসীদের উপর।

● এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০২৬

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে

– কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

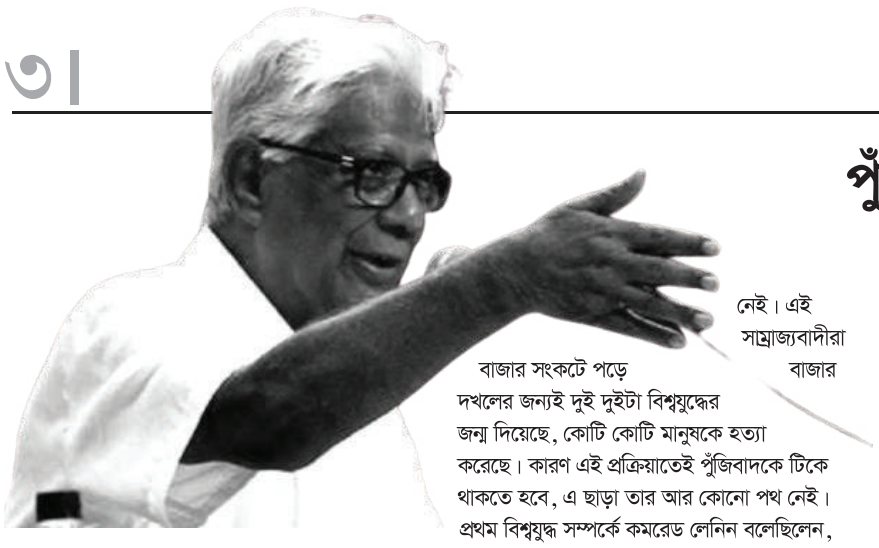

(২০১৫ সালের নভেম্বরে মহান রুশ বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী এবং আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেটে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি রুশ বিপ্লব, তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও জাতীয় রাজনীতি- এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেই বক্তব্যসমূহ সংকলন করে ও পরবর্তীতে কমরেড মুবিনুল হায়দারের আরও কিছু সংযোজনীসহ এই বক্তব্যটি 'সাম্যবাদ' পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গত ৬ জুলাই ছিল তাঁর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী। আমরা তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে লেখাটির অংশবিশেষ পুনঃমুদ্রণ করছি)

...আজকের যুগে অর্থাৎ লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের এ যুগে বিশ্বপুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সংকট আগের চেয়ে আরও ব্যাপক, ভয়াবহ ও জটিল রূপ ধারণ করেছে।

১৯১৬ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ- পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' বইটিতে দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের ঊষালগ্নের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ আর নেই। উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতি কাঁচামাল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছে। এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শিল্প পুঁজি ও ব্যাংক পুঁজির মিলন ঘটিয়ে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়েছে ও তা তুলনামূলক সস্তা শ্রমের দেশগুলোতে খাটাচ্ছে। এভাবে পুঁজি রপ্তানি করে অন্য দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল শোষণ করার এই চরিত্রটি ছিল পুঁজিবাদের পূর্বতন বৈশিষ্ট্য থেকে নতুন এবং লেনিন এর নাম দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ। লেনিন বলেছিলেন, এই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর। এরপর পুঁজিবাদের বিকশিত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। এই সাম্রাজ্যবাদীরা বাজার সংকটে পড়ে বাজার দখলের জন্যই দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। কারণ এই প্রক্রিয়াতেই পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে হবে, এ ছাড়া তার আর কোনো পথ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে কমরেড লেনিন বলেছিলেন,

"The war of 1914-18 was imperialist (that is, an annexationist, predatory, war of plunder) on the part of both sides; it was a war for the division of the world, for the partition and repartition of colonies and spheres of influence of finance capital."
(Imperialism: The highest stage of capitalism)

আজকের এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগবৈশিষ্ট্য এক থাকা সত্ত্বেও তার মাত্রা আজ একই রকম নেই। লেনিনের সময় থেকে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সংকট আরও প্রকট হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সব রকম সংকট সত্ত্বেও পুঁজিবাদের যে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল, তা আজ আর নেই। সে এখন প্রতি মুহূর্তে সংকটে পড়ছে, তা থেকে বাঁচার জন্য সে যে রাস্তা বেছে নিচ্ছে, তা তাকে আরও গভীর সংকটে নিমজ্জিত করছে। এককথায় পুঁজিবাদের সংকট আজ এবেলা-ওবেলার সংকটে পরিণত হয়েছে।

সংকট থেকে বাঁচার জন্য পুঁজিবাদ দেশে দেশে অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ সমস্তশিল্প যখন মন্দায় ডুবছে, তখন ব্যাপক পরিমাণে সামরিক শিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই প্রবণতাটি ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "শিল্পের সামরিকীকরণ বলতে বোঝায়, সরকার যেখানে নিজেই অর্ডার দেয়, আবার সেই মাল সরকার নিজেই কেনে। উৎপাদিত মাল বিক্রির জন্য বাজারের উপর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না। শুধু সামরিক খাতে সরকারের বাজেট বাড়তে থাকে। ফলে, মন্দা অর্থাৎ, যাকে আমরা বলি বাজার নেই, কাজকর্ম নেই, অর্ডার নেই, এই সমস্যার হাত থেকে সাময়িকভাবে হলেও শিল্পগুলো বাঁচে। অবস্থাটা দাঁড়ায় এইরকম যে, সরকার নিজেই 'প্লেন' তৈরি করার, 'ফাইটার' তৈরি করার এবং নানা সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করার অর্ডার দেয়, আবার এই তৈরি মালগুলো সরকারই কেনে। ফলে, বাজারের উপর বা লোকের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না বলে সাময়িকভাবে 'রিসেশন' বা বাজার-মন্দার চাপ থেকে অর্থনীতিকে কিছুটা পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, এই পরিকল্পনার আবার একটা কন্ট্রাডিকশন বা উল্টোদিক আছে। তা হলো এই যে, যত মাল বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতে থাকবে- সেগুলি যদি বসে থাকে, অর্থাৎ সেগুলি যদি খালাস করা না যায়, তাহলে মাল ক্রমাগত জমতে থাকার ফলে অর্থনীতিতে বদ্ধ্যাত্বের ঝোঁকের (টেন্ডেন্সি অব স্ট্যাগনেশন) জন্ম হবে এবং এর ফলে সামরিক শিল্পেও আবার লালবাতি জ্বলতে শুরু করবে। অথচ সরকার বিনা প্রয়োজনে এই মালগুলো কিনে গুদামজাত করতে পারে না। কাজেই এই মাল খালাস করার প্রয়োজনেই তাদের চাই স্থানীয় ও আংশিক যুদ্ধ।"

তাই আজ দেখা যায়, অর্থনীতির সামরিকীকরণই সকল বড় বড় পুঁজিবাদী দেশের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ। আমেরিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ। বিশ্বের মোট জিডিপির ২২ শতাংশের যোগানদাতা হলো আমেরিকা। কিন্তু এ দিয়ে আমেরিকার অর্থনীতিকে বোঝা যাবে না। ঐ বিশাল অর্থনীতি আজ কাঁপছে। আমেরিকার অর্থনীতির আকার ১৭.৮৪১ ট্রিলিয়ন ডলার। আর তার ঋণের পরিমাণ ১৮.১ ট্রিলিয়ন ডলার। আজ আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত জাতি। অথচ সে বাহ্যিকভাবে মহাশক্তি নিয়ে আছে। সেটি অস্ত্র উৎপাদনের মধ্য দিয়ে গায়ের জোরে অন্য দেশের উপর হামলা করে। বাস্তবে তার গোটা অর্থনীতিই যুদ্ধ অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে চোরাবালির উপর দাঁড়ানো। যে কোনো সময় ধসে পড়ল বলে।

আমেরিকার ১৬টির বেশি গোয়েন্দা সংস্থা আছে দেশে-বিদেশে গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর জন্য। যেখানে এক লক্ষ সাত হাজারেরও বেশি লোক কাজ করে। সম্প্রতি কাউন্টার টেরোরিজম সিস্টেমে নতুন করে দশ হাজার লোক নেওয়া হয়েছে। এরা হলো আর্মি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির বাইরের লোক। আর্মি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে দশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। এগুলো হলো গোটা ডিফেন্স সিস্টেমে সরাসরি যুক্তদের একটি গড় হিসাব। তাও যে সকল তথ্য প্রকাশিত, সেগুলো অনুসারে। এর সাথে যুক্ত হবে এই বিরাট অস্ত্র উৎপাদনের সাথে সহযোগী শিল্প ও ব্যবসাসমূহ। সেখানে যুক্ত আরও লক্ষ লক্ষ লোক। ডিফেন্স বাজেট কমানোর কথা কংগ্রেসে এক সদস্য বলেছিলেন, কয়েকজন তাকে সমর্থনও করেছিলেন। অস্ত্র কোম্পানির মালিকেরা তাতেই চোখ রাঙিয়ে বললেন, তাহলে আমেরিকায় এক ধাক্কায় মিলিয়ন মিলিয়ন লোক বেকার হয়ে যাবে। এই হলো আমেরিকার শিল্পোন্নতির নমুনা।

আমরা আগেই বলেছি, অস্ত্র উৎপাদন চালু রাখতে হলে তাকে খালাসও করতে হবে। এর জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন। আজ আমেরিকা সারা বিশ্বে আংশিক ও খণ্ড যুদ্ধ চালু রেখেছে। আমেরিকা যে সারা দুনিয়া ঘুরে 'সবার ভালো করতে চায়, সবার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সে যে ছটফট করে, ছুটে যায়' –তার আসল রহস্য এখানে। তার অস্ত্র খালাসের প্রয়োজনে সে এর খবর তাকে বলে, ওর খবর একে দেয়, খবর তৈরি করে, খবর বিক্রি করে, এর বিরুদ্ধে তাকে লাগায়। অর্থাৎ যুদ্ধ বা সংঘর্ষ না থাকলে তার অর্থনীতি চোখ বুজবে।

তাই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করে, তাকেই আবার অস্ত্র সরবরাহ করে। অর্থাৎ এ যুদ্ধ জয়ের জন্য নয়। বিজয়ী হলে যুদ্ধ থেমে যাবে। তাই জয় দরকার নেই, যুদ্ধ দরকার। আইএস-এর ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। আবার রাশিয়া আইএস ঘাঁটিতে টানা হামলা মৌলবাদের হাত থেকে মানবতা রক্ষার জন্য করেনি। একদিকে আসাদের পতন ঘটলে ও সিরিয়ায় মার্কিন আধিপত্য তৈরি হলে রাশিয়ার জন্য ভীষণ সমস্যা, আবার তার অস্ত্রও খালাস হওয়া দরকার। আমেরিকার পরে সে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র ব্যবসায়ী দেশ। আমেরিকা বিশ্বের অস্ত্র রপ্তানির ৩১ শতাংশের যোগানদাতা, রাশিয়া ২৭ শতাংশের। তাই তারও যুদ্ধ দরকার।

গোটা দুনিয়ায় যখন যাকে দরকার তাকেই আক্রমণ করছে আমেরিকা ও ন্যাটো জোট, যেখানে আছে বড় বড় পুঁজিবাদী দেশসমূহ। তার জন্য কোনো কারণ দেখানোর দরকার নেই। পত্রিকায় একটা কিছু বললেই হলো। তার ঠিক-বেঠিকেরও ব্যাপার নেই। ভুল অভিযোগ তুলে ইরাক আক্রমণ করে গোটা ইরাককে তছনছ করে দেওয়া হলো। আজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার স্বীকার করছেন, সেটি ভুল ছিল। তাহলে কেন আক্রমণ করা হলো? কারণ আক্রমণ না হলে, যুদ্ধ না হলে তাদের অর্থনীতি বাঁচবেনা।. . .

● ২য় পৃষ্ঠার পর

কেন অপূর্ণ রয়ে গেল জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা

শ্রমিকদের অবস্থা আজও বদলায়নি। শ্রমিক ছাঁটাই, নির্যাতন চলছেই। উপরন্তু ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপায় অটোরিক্সা কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসার রাস্তাও সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর হকার উচ্ছেদের নামে এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবন বিভীষিকাময় করে তোলা হয়েছে।

বিএনপি সংস্কার চাইছে না, অন্যরা কি সত্যিই চান

জনগণের আকাঙ্ক্ষার চাপে কিছু সংস্কারের কথা বললেও বাস্তবে বিএনপি সংস্কার চায় না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে সংস্কারের পক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। ক্ষমতায় এসে বিএনপি এই অধ্যাদেশগুলো আর আইনে পরিণত করেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ ছিল বিচার বিভাগের আলাদা সচিবালয়– সেটা বিএনপি সংসদে তুলতেই দেয়নি। শ্রম আইন সংস্কার অধ্যাদেশে কিছুটা অধিকার শ্রমিকদের দেয়া হয়েছিল, মালিকদের স্বার্থে সেটাও সংশোধন করে সংসদে তোলা হয়েছে। নিজেদের ইশতেহারে উল্লেখ করা এজেন্ডাগুলোও বিএনপি এখন আর বাস্তবায়ন করতে চাইছে না। অর্থাৎ সেই একই বিষয়, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য যা যা করতে হয়– সবই করবে বিএনপি।

অপরদিকে জামায়াত ও এনসিপি কি সত্যিই সংস্কার চায়? তারা কি একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কারের দাবি করছেন? জামায়াত বিগত সময়ে কখনই সংস্কার প্রশ্নে কোন শব্দ উচ্চারণ করেনি। তাদের সংস্কারের বক্তব্যই এসেছে গণঅভ্যুত্থানের পর। অথচ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের এক দশকেরও আগে থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সংবিধানের সংস্কার দাবিগুলো উঠেছে। বিগত সময়ে জামায়াত যখন বিএনপির সাথে ক্ষমতায় ছিল তখন র‍্যাব গঠন, অপারেশন ক্লিন হার্টের মাধ্যমে বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড– এ সবই তারা সমর্থন করেছে। বাস্তবে জামায়াত সংস্কারের এই দাবিগুলো করেছে রাজনৈতিক দর কষাকষির জন্য। সংস্কার তাদের কাছে দরকষাকষির একটা মাধ্যম মাত্র।

অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেয়া ছাত্রদের নিয়ে গঠিত এনসিপি এই সংস্কারগুলো আন্তরিকতার সাথে চাইলে প্রচলিত রাজনীতিতে গা ভাসাতো না। অল্প সময়ে বিপুল অর্থ খরচ করে জামায়াতের সমর্থন নিয়ে সংসদে গেছেন তারা। কার সাথে জোটে যাবেন এ নিয়ে নির্বাচনের আগে তারা দুই বড় দলের সাথেই দরদাম করেছেন। বিএনপি ও জামায়াতের সাথে কথাবার্তার পর জামায়াতকে তারা বেছে নিয়েছেন। যদি বিএনপি থেকে অধিক সুবিধা ও নিশ্চয়তা তারা পেতেন তাহলে তারা বিএনপির সাথেই থাকতেন। নিজেদের জোটের দলকে তারা সংস্কারবিরোধী বলতেন না।

ফলে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার বেদনাদায়ক পরিণতি ঘটেছে। কিন্তু এটা ঠিক যে এর মৃত্যু ঘটেনি। যারা আন্তরিকভাবেই সংস্কার চান, সংস্কার যাদের কাছে দর কষাকষির হাতিয়ার নয়– এমন অনেক শক্তি মাঠে আছে। একটা বিরাট সংখ্যার সাধারণ জনগণ আছেন। তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা এই অভ্যুত্থানের পর থেকেই বলে আসছিলাম, আন্দোলনকারী শক্তির ঐক্যবদ্ধতাই পরিবর্তনের গ্যারান্টি। এর বাইরে কোন গ্যারান্টি নেই।

আন্দোলন কিংবা গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বে সঠিক রাজনৈতিক শক্তি না থাকলে সেই আন্দোলন তার আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল ঘরে আনতে পারে না। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। অভ্যুত্থানে নেতৃত্বকারী ছাত্রনেতারাও জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে চাননি, যে কোন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়াকেই প্রধান লক্ষ্য করেছেন। বর্তমান সংসদে উপস্থিত সবগুলো রাজনৈতিক দল যে যেমন পারে, সে তেমন করে দলীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দা তুলেছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে জনগণের একমাত্র বিকল্প ও ভরসা হতে পারে বামপন্থীরা। তাই বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির করণীয় হলো জনগণকে যুক্ত করে ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

দুই বছর পর এসে দেশের মানুষ দেখছে– আওয়ামী লীগ গেছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদ যায়নি। যাবেও না। যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই নির্মম ফ্যাসিবাদ সৃষ্টি ও কায়েম করে রেখেছে, সেটা বহাল রেখে ফ্যাসিবাদ যাবে না। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ না ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সম্ভব নয়। তা না হলে অনেক আত্মত্যাগের মাধ্যমে বারবার ভোটের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার অর্জিত হবে– আর গণআন্দোলনের শক্তি দুর্বল হলে, আন্দোলনের নেতৃত্ব পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের দলগুলোর হাতে থাকলে, বারবারই তা হাতছাড়া হবে। আবারও নেমে আসবে নির্মম গণতন্ত্রহীন পরিবেশ। ফলে কোন সংস্কারই শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিতে পারবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ফ্যাসিবাদ থেকে কোন মুক্তি নেই।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক বিপ্লবী পার্টিকে শক্তিশালী করার আহ্বান

বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এদেশের অনন্যসাধারণ বিপ্লবী চরিত্র কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভা গত ৬ জুলাই ২০২৬, জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হুসেন চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা ও সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড রাশেদ শাহরিয়ার। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য ও কমরেড তসলিমা আক্তার বিউটি।

সভায় বক্তারা বলেন, “২০২১ সালের ৬ জুলাই, ৮৭ বছর বয়সে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী প্রয়াত হন। তিনি আমৃত্যু এদেশের শোষিত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ও চরিত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে শৈশবেই ভারতে এসইউসিআই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি শরণার্থী শিবিরে কাজ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে আসেন। সদ্যস্বাধীন দেশে বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে জনগণ যুদ্ধ করেছিল, তাদের স্বপ্ন অপূরিত থেকে যায়। এদেশে পুরাতন ও প্রচলিত বামপন্থী রাজনীতির ধারা মুক্তিযুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা নিতে পারেনি, শোষিত মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে দেশের যুবক-তরুণরা এই শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধারণ করলেও সঠিক পথের দিশা না পাওয়ায় দিকভ্রান্ত – এরকম প্রেক্ষাপটে এদেশের শ্রমজীবী মেহনতী সাধারণ মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণির দল গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশে আসেন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে পাথেয় করে সারাজীবন ধরে এদেশে শোষিত মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় তিনি শিখিয়েছেন, বিপ্লবী রাজনীতির চেয়ে মর্যাদাময় জীবন আর নেই। রাজনীতি হলো হৃদয়বৃত্তি, বিপ্লবী রাজনীতি হলো উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। শোষিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালবাসা ও দরদবোধই এই রাজনীতির আধার।”

বক্তারা আরও বলেন, “আজকের এই যুগে সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক অবক্ষয় চলছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনকেও তা প্রভাবিত করছে। তাই এই যুগে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হলে কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। এই শিক্ষায় দলের কর্মীদের তিনি গড়ে তুলেছেন। জীবনভর সংগ্রামে তিনি অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী তৈরি করেছেন। ‘দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন’ এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর শিক্ষায় আজকের দিনে এই চরিত্র গড়ে তোলার সাধনার পাশাপাশি দেশের শোষিত মানুষের মুক্তির লড়াইকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে।"

ছাত্র ফ্রন্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১৬ তম সম্মেলন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

শিক্ষা-সংস্কৃতি-সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ধারাকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলনায়তনের মুক্তমঞ্চে আজ ১০ জুলাই সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাকৃবি শাখার ১৬ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদ রাফিকুজ্জামান ফরিদ, কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক গৌতম কর এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্ক্সবাদী) ময়মনসিংহ জেলা শাখার সমন্বয়ক শেখর রায়।

আলোচনা সভা শেষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সভাপতি সালমান সিদ্দিকী জায়েদ হাসান ওয়ালিদকে সভাপতি ও জাবের ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট ২৬ তম কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন । পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রাক্তন-বর্তমান কর্মী সমর্থক শুভানুধ্যায়ীদের দিনব্যাপী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য, ময়মনসিংহ জেলার সমন্বয়ক শেখর রায়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বাকৃবি শাখার সাবেক সভাপতি ও কৃষিবিদ কেন্দ্রের আহ্বায়ক আবু আরমান অঞ্জন, বাকৃবি শাখার সাবেক সভাপতি দোলন রায়, সাবেক সভাপতি সেঁজুতি চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস, সাবেক সাধারণ সম্পাদক পরমানন্দ দাসসহ প্রাক্তণ সংগঠক-কর্মীবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সালমান সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক কাজী শেখ ফরিদ, সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতৃত্ববৃন্দ।

রংপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক ফোরামের কমিটি গঠন

গত ২৪ জুন ২০২৬ বিকাল ৪ টায় ধাপ সর্দারপাড়ায় প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে এক নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎ গ্রাহক ফোরাম রংপুর জেলার আহ্বায়ক অধ্যাপক মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সদস্যসচিব আহসানুল আরেফিন তিতু, সদস্য আবু ছালেক প্রমুখ। এছাড়াও প্রিপেইড মিটারের ভুক্তভোগী গ্রাহকগণের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার,আব্দুল করিম,মহুবার রহমান প্রমুখ। ভুক্তভোগী গ্রাহকগণ বলেন প্রিপেইড মিটার লাগানোর পর আমাদের বিদ্যুৎ খরচ দুই থেকে তিনগুণ বেড়ে গেছে। সভা শেষে বিদ্যুৎ গ্রাহক ফোরামের ধাপ সর্দারপাড়া কমিটি গঠন করা হয়।

ব্রীজ মেরামতের দাবিতে কুলাউড়ায় সমাবেশ

কুলাউড়া উপজেলার ৭নং সদর ইউনিয়নের গুতাগুতি গ্রাম এবং ১৩নং কর্মধা ইউনিয়নের হাশিমপুর গ্রামের মাঝামাঝি অবস্থিত ফানাই নদীর উপরের ব্রীজের মধ্যখানে ভাঙন দেখা দেওয়ায় চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন এই সড়ক ব্যবহার করে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী মানুষ এবং অসংখ্য সাধারণ পথচারী। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই জরুরি ভিত্তিতে ব্রীজটি মেরামতের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) কুলাউড়া উপজেলা শাখার উদ্যোগে গত ১০ জুলাই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কুলাউড়া উপজেলার আহবায়ক প্রশান্ত দেব ছানা, সদস্য সচিব সাদমান সৌমিক মজুমদার, সদস্য নিখিল দেবনাথ, শহিদুল আলম গৌছ সহ স্থানীয় জনসাধারণ।

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০২৬

বাংলাদেশ হরিজন অধিকার আদায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় ১৬ লক্ষ হরিজন জনগোষ্ঠী এখনো সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে বঞ্চনার শিকার। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে হরিজন জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক, মানবিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'হরিজন অধিকার আদায় সংগঠন' লড়াই করে যাচ্ছে। তার ধারাবাহিকতায় সারাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২৬ জুন শুক্রবার দিনব্যাপী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশের সেমিনার কক্ষে প্রথম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিলে সুরেশ বাঁশফোরকে সভাপতি এবং প্রশান্ত হাঁড়িকে সাধারণ সম্পাদক করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির পরিচিতি ও আগামীদিনের লড়াই সংগ্রামের দাবিসহ আন্দোলন কর্মসূচি তুলে ধরে পরবর্তীতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নব-গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ হরিজন অধিকার আদায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নব নির্বাচিত সভাপতি সুরেশ বাঁশফোর। এসময় সংগঠনের সিনিয়র-সহসভাপতি ওমর সিং হেলা, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত হাঁড়ি, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রান্ত বাঁশফোর ও সংগঠনের বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত, বাংলাদেশ মাইনরিটি রাইটস ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট উৎপল বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম পাঠাগারের উদ্বোধন

২৬ জুন ঢাকার টিকাটুলির ২৩/৫ কে এম দাস লেনে মওলানা ভাসানী ট্রাস্ট পরিচালিত কাজী নজরুল ইসলাম পাঠাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাঠাগারের সংগঠক প্রগতি বর্মণ তমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক শিক্ষক ও বিশিষ্টশিক্ষানুরাগী মুবিনা মুস্তফা, মওলানা ভাসানী ট্রাস্টের সদস্য ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন গাজীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সংগঠনের ১৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ জুলাই জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করেন জেলা সভাপতি মাসুদ রেজা, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

দেশব্যাপী দাবি সপ্তাহ পালিত

জ্বালানি তেল-বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো, অসম বাণিজ্য চুক্তি বাতিল ও জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ ৭ দফা দাবি

ঢাকা

সিলেট

জ্বালানি তেল-বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো, সর্বজনীন রেশনিং চালু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্য চুক্তি বাতিল, জুলাই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত, মিথ্যা মামলা ও হয়রানি বন্ধ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিক সংস্কার নিশ্চিত, সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজসহ ৬টি মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত, শ্রমিকের ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নিশ্চিত, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চিনিকল-পাটকল চালু, কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, সার, বীজ, কীটনাশকে পর্যাপ্ত ভর্তুকি নিশ্চিত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ, নারী নির্যাতন-ধর্ষণকারীদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবিতে গত ১৬-২২ জুন বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে দেশব্যাপী দাবি সপ্তাহ পালিত হয়েছে। এসময় ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, গাইবান্ধা, ফেনী, নোয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় দাবি সম্বলিত প্রচারপত্র বিতরণ, পথসভা ও মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নোয়াখালী

চট্টগ্রাম

বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি নয়, ক্যাপাসিটি চার্জ বাতিল কর

● ১ম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করার। বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে সিস্টেম লস কমানোর নির্দেশনা দেওয়া স্বত্তেও কেন ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির সিস্টেমে ফেঁসে গেল সরকার? আসুন, সিস্টেমটা ঠিকমত বুঝে নিই।

সর্বশেষ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্য গড়ে ৮.৫ শতাংশ এবং পাইকারি মূল্যহার ৫.০৭ শতাংশ বেড়েছিল। এবার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বাড়তি ব্যয় মোকাবিলার লক্ষ্যে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রিসভা কমিটির পরামর্শে মূলত বিদ্যুৎ বিভাগ দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবটি দিয়েছে। দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে- জ্বালানি আমদানি ব্যয়ের উর্ধ্বগতি, উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়মূল্যের বড় ব্যবধান এবং ভর্তুকির বাড়তি চাপ সামাল দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড় ভর্তুকি প্রায় ৫.৫০ টাকার বেশি। চলতি অর্থবছরে বিপিডিবি'র সম্ভাব্য ঘাটতি দাঁড়াতে পারে প্রায় ৫৬ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ৩৬ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ দেবার পরেও আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে ১৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত ভর্তুকির প্রয়োজন হতে পারে। বিপিডিবি দাবি করছে নতুন মূল্যহার কার্যকর হলে আগামী অর্থবছরে সরকার প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি সাশ্রয় করতে পারবে। তবে মূল্যবৃদ্ধির পরও বিদ্যুৎ খাতে সরকারের প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হতে পারে।

বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি ১৩৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং আমদানি (ভারত ও নেপাল থেকে) মিলিয়ে মোট ২৮ হাজার ৯১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ১৮ হাজার মেগাওয়াট কিন্তু গড়ে দৈনিক ১২ হাজার মেগাওয়াট হারে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্যুতের গড় উৎপাদনের দ্বিগুণের বেশি উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি করে রাখা হয়েছে। আবার অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্র পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অব্যবহৃত থাকলেও নিয়মিত ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে, ফলে উৎপাদন কমলেও ব্যয় কমছে না। এমনকি কোনো কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন কমেছে, উল্টো ক্যাপাসিটি চার্জ বেড়েছে। উৎপাদন খরচ ও ভর্তুকির প্রায় ৪০% ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ দেবার ফলে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ২০১১ সালে বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি ক্যাপাসিটি চার্জ ২.৩৫ টাকা থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে হয়েছে ৫.১২ টাকা। আর ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি ক্যাপাসিটি চার্জ হতে পারে ৫.৪৬ টাকা (সম্ভাব্য)। এর ফলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক লোকসান দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। প্রশ্ন হলো, এই পাহাড়প্রমাণ ক্যাপাসিটি চার্জের দায় কেন বহন করতে হচ্ছে? বস্তুত, সরকারের সাথে করা চুক্তি অনুযায়ী বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে অলস বসিয়ে রাখলে তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর্তুকি দিতে হয়, যা ক্যাপাসিটি চার্জ নামে পরিচিত। দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট সক্ষমতার মাত্র ৫৬ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলেও, বাকি ৪৪ শতাংশ বিদ্যুতকেন্দ্র চুক্তি অনুযায়ী প্রায় ৪৫-৪৮ হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ পায়। বিদ্যুৎ খাতের লোকসান কমানোর জন্য ক্যাপাসিটি চার্জ কমানো এই মূহুর্ত থেকে কার্যকর করা দরকার।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) তথ্য অনুযায়ী, "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" এর অধীনে বিনা দরপত্রে দেশের ৯১টি বেসরকারি ও ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাথে চুক্তি করা হয়েছিল। যদিও আইনটি ছিল সাময়িক জরুরি ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে, কিন্তু একাধিক মেয়াদ বাড়িয়ে এটি ১৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে কার্যকর রাখা হয়। যার প্রেক্ষিতে এটি বিদ্যুৎ খাতের চুক্তির প্রধান আইনি কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। আবার মোট চুক্তির একটি বিশাল অংশ পেয়েছিল বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ নির্দিষ্ট কয়েকটি বড় শিল্প গ্রুপ– সামিট গ্রুপ, ইউনাইটেড গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, বেক্সিমকো, ডরিন পাওয়ার, এবং এনার্জিপ্যাক। ৩টি বড় কর্পোরেশনই (সামিট, ইউনাইটেড এবং বিসিপিসিএল) মোট ক্যাপাসিটি চার্জের প্রায় ৩৫ শতাংশ অর্থ তুলে নিয়েছিল। উপরন্তু আমদানিকৃত তরল জ্বালানি– প্রধানত ফার্নেস অয়েল এবং ডিজেল ও কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ইউনিটপ্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অনেক বেশি। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে অতিরিক্ত মূল্যে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকদের সরবরাহ করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিতে হয়েছে। একইভাবে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির 'দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০' -এর আওতায় কোনো ধরনের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা ছাড়া এবং অস্বাভাবিক স্থান ও কয়লা আমদানির শর্ত সম্বলিত আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ চুক্তির স্বাক্ষর প্রক্রিয়ায় যুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনক অর্থ লেনদেন, ভ্রমণ ও অর্থপ্রদান, ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় বেশি মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়, সরাসরি ঘুষ লেনদেনের তথ্য-প্রমাণসহ ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। শতে আরও উল্লেখিত হয়েছে যে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে আদানির কোনো ক্ষতি হলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার ও ক্ষতিপূরণ বাংলাদেশকে বহন করতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০' গত ৩০ নভেম্বর ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তবে আইনটি বাতিল করা হলেও, এর অধীনে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো বহাল থাকবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। আদানির সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি তদন্ত করে এতে ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এখনও আদানির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সালিশিতে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেনি। কিন্তু বকেয়া অর্থ ও কয়লার দাম বাবদ ৫৭ কোটি ডলার পাওনা দাবি করে ভারতের আদানি গ্রুপ বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টারে সালিশি মামলা দায়ের করেছে। এই আন্তর্জাতিক সালিশ মোকাবিলায় যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় আইনি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেবার পাশাপাশি বাংলাদেশ হাইকোর্টের তরফ থেকে আদানিকে সালিশি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশে জ্বালানি, বিদ্যুত সহ নিত্যপণ্যের উর্ধ্বমুখী দামের আগুনে জ্বলতে থাকা দেশবাসীর কাছে তা কতটুকু স্বস্তিদায়ক?

বাংলাদেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইএমএফ ২০২৩ সালে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়। সে ঋণের একটি শর্ত ছিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমাতে হবে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আইএমএফের কাছে আবার ঋণ চেয়েছে। আইএমএফ বলেছে ২০২৭ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভর্তুকি পুরো তুলে দেওয়া ও বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হবে।

এভাবে অপরিকল্পিত, আমদানি-নির্ভর, অন্যায্য ও লুণ্ঠনমূলক চুক্তির কারণে বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদকদের সঙ্গে করা চুক্তিতে একাধিক সুবিধা, যেমন– উৎপাদন হোক বা না হোক নিশ্চিত ক্যাপাসিটি চার্জ, বিদ্যুৎ না নিলেও অর্থ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা, জ্বালানির দাম সরাসরি ভোক্তার ওপর চাপানোর সুযোগ, বৈদেশিক মুদ্রার দরের সঙ্গে মূল্য সমন্বয় এবং রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি এ খাতকে চির লোকসানের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিদ্যুতের একমাত্র ক্রেতা হিসেবে পিডিবি উৎপাদন পর্যায়ের সব অতিরিক্ত ব্যয় বহন করছে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো কার্যত সব ধরনের বাণিজ্যিক ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য তৈরি হয় দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ ব্যয়ের ফাঁদ। আর এই চাপ শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে নিম্ন আয়ের জনগণের উপর।

জুলাই গণহত্যাঃ বিচার কোন পথে

● ১ম পৃষ্ঠার পর

গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্বাভাবিক-ভাবেই জনগণের অন্যতম প্রধান প্রত্যাশা ছিল গণহত্যা, গুম, নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করা। কারণ বিচারহীনতার সংস্কৃতি বারবার স্বৈরতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। অতীতের অপরাধের বিচার না হওয়ায় বারবার নতুন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ফলে মানুষ আশা করেছিল, এবার অন্তত দায়ীদের আইনের আওতায় আনা হবে এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একদিকে তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে নানা প্রক্রিয়াগত দুর্বলতার অভিযোগ উঠছে। অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে ঢালাও ও ব্যাপক মামলা দায়েরের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এমন ব্যক্তিদেরও হত্যা মামলার আসামি করা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি বা অন্য ধরনের অভিযোগ আছে কিন্তু হত্যাকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এতে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। মানুষ ভাবতে শুরু করছে, প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি হয়রানিমূলক বা দুর্বল ভিত্তির মামলাও যুক্ত হচ্ছে কি না।

এই ধরনের প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ বিচার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা। জনগণ যদি মনে করে যে বিচার রাজনৈতিক প্রতিশোধ বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হাতিয়ার হয়ে উঠছে, তাহলে প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের দাবিও দুর্বল হয়ে পড়ে। গণহত্যার মতো গুরুতর অপরাধের বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ তৈরি হয়। এতে শেষ পর্যন্ত লাভবান হয় সেই সব শক্তিই, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

একইভাবে কোনো রাজনৈতিক শক্তির সব ধরনের কার্যক্রম নির্বিচারে নিষিদ্ধ করা বা তাকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক পরিসর থেকে সরিয়ে দেওয়ার নীতিও দীর্ঘমেয়াদে কাঙ্ক্ষিত ফল নাও দিতে পারে। অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিচার হওয়া প্রয়োজন। কেবল নিষেধাজ্ঞা বা প্রশাসনিক পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করলে অনেক সময় সেই শক্তি নিজেকে নিপীড়িত হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়। তখন সমাজের একটি অংশের মধ্যে তাদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন অভিজ্ঞতা নতুন নয়। আওয়ামী লীগও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমন করার নীতি গ্রহণ করেছিল। অতীতে শাসকগোষ্ঠীর এই দমনমূলক নীতিই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পুনরুত্থানের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ফলে রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। জনগণের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা ছাড়া কোনো টেকসই সমাধান সম্ভব নয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মূল শিক্ষা এখানেই। এই আন্দোলন কেবল একটি সরকারের পতনের জন্য সংঘটিত হয়নি। এটি ছিল জবাবদিহিতা-মূলক রাষ্ট্র, ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জনগণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের চেতনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে বিচার হতে হবে ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ। গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িতদের অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। কিন্তু সেই বিচার হতে হবে প্রমাণ, আইনি প্রক্রিয়া এবং ন্যায়বিচারের নীতির ভিত্তিতে।

জুলাইয়ের শহীদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে তখনই, যখন তাদের আত্মদানের মাধ্যমে অর্জিত সম্ভাবনাকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের পথে কাজে লাগাতে পারব। বিচারহীনতা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ারে পরিণত করাও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রয়োজন এমন ন্যায়বিচার, যা শুধু অতীতের অপরাধের হিসাবই নেবে না, ভবিষ্যতে কোনো দল, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রীয় শক্তি যেন জনগণের বিরুদ্ধে একই ধরনের অপরাধ সংঘটনের সাহস না পায়, সেই নিশ্চয়তাও তৈরি করবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্তির প্রাক্কালে এই প্রশ্নগুলো তাই নতুন করে সামনে এসেছে এবং ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

চট্টগ্রাম,কক্সবাজারসহ সারাদেশের বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ
বন্যাদুর্গত এলাকায় দ্রুত সরকারি ত্রাণ সহযোগিতার দাবি জানিয়েছে বাসদ (মার্কসবাদী)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা গত ১১ জুলাই ২০২৬ এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজারসহ সারাদেশের বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বন্যাদুর্গত এলাকায় দ্রুত সরকারি ত্রাণ সহযোগিতার দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "কয়েকদিনের অতিভারী বৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বাড়ায় চট্টগ্রামের বাঁশখালী, সাতকানিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ঘরবাড়ি ও জমির ফসল পানিতে তলিয়ে গিয়েছে, ১০ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে এবং বন্যাদুর্গত এলাকায় খাবার ও খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিনে কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম জেলায় পাহাড় ধ্বসের ঘটনায় অন্তত ৩৯ জনের মৃত্যুর তথ্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী দুইদিন ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে নদনদীর পানি বেড়ে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ও পাহাড় ধ্বস বাড়তে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ হতে বন্যাদুর্গত এলাকায় সরকারি ত্রাণ তৎপরতা খুব সীমিত। আমরা সরকারের কাছে অবিলম্বে বন্যাকবলিত এলাকাকে 'দুর্গত এলাকা' ঘোষণা করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর দাবি জানাচ্ছি। একইসাথে আমরা সারাদেশের জনগণকে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানাচ্ছি।"

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০২৬

বিশ্বকাপ ফুটবল : মানুষকে মেলায় ফুটবল, ভাগ করে সাম্রাজ্যবাদ

আর্থিক সংকট, রাজনৈতিক প্রতারণা, নিরাপত্তাহীনতা, নৈতিকতা-মূল্যবোধের অবনমন ইত্যাদির ফলে প্রতিনিয়ত হতাশা, অবসাদ, মানসিক অশান্তি দানা বাঁধছে ঘরে ঘরে। পরিবার, সমাজ সবখানেই আপ্রাণ চেষ্টা করেও টিকছে না সম্পর্কের দড়ি, ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন ক্রমাগত 'তুমি আর আমি যাই সরে সরে'। এই আকালের কালে বিশ্বকাপ ফুটবল যেন ভাঙ্গা কুঞ্জবনে বাঁশি বাজাতে এসেছে। বিচ্ছেদের চৌম্বকীয় শক্তির বিপরীতে ফুটবল জাদুতে জুড়ছে মানুষ টিএসসিতে, পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকানে, বন্ধুর বাসায়। শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ, রাম-রহিম, আমেনা-ঋতুপর্ণা একসাথে উল্লাসে মেতে উঠছে বিপক্ষ দলের জালে বল জড়িয়ে গেলে। প্রিয় খেলোয়াড়ের ড্রিবলিং আর পাসে আনন্দে ভাসছে নগর থেকে গ্রাম। চার বছর পরপর বিশ্বকাপ ফুটবল যেন বন্যা আনে সমাজে। বেনো জল সবাইকে সমান ডুবায়। উঁচু অট্টালিকা থেকে পর্ণ কুটিরে উড়তে থাকে প্রিয় দলের পতাকা। চাঁদা তুলে পতাকা টানানো, প্রজেক্টর যোগাড়, খাবার আয়োজন, গ্রাফিতি আঁকতে আঁকতে পুরাতন শত্রুতা যেন ছুটি নেয়। মধুর শত্রুতায় ভরে যায় দেশ। ব্রাজিল আর্জেন্টিনার সৈনিকরা টিনের তলোয়ার(!) নিয়ে পরস্পরের সাথে যুদ্ধের নাটকে নামে। সে যুদ্ধে বন্ধু দাঁড়ায় বন্ধুর বিপরীতে, বাবা-ছেলের, ভাই-ভাইয়ের। প্রতিদিনের সত্যিকার দ্বন্দ্বে ক্লান্ত আমরা এই মধুর শত্রুতায় একটু হলেও হাফ ছেড়ে বাঁচি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, পাড়া-মহল্লায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কান পাতলেই এ যুদ্ধের আওয়াজ শোনা যায়। দু'একটা দুর্ঘটনা ছাড়া এ যুদ্ধ চলে হাসি, তামাশা, টিটকারি, টিপন্নীতে। অলিখিত এই উৎসবে চাপাতি ছেড়ে যোগ দেয় সেই ছেলেটাও যে রাতের আঁধারে নিরীহ পথচারীর সর্বস্ব কেড়ে নেয়, নেশাদ্রব্য ছেড়ে আসে কেউ। গবেষণায় দেখা যায় বিশ্বকাপ ফুটবল চলাকালীন সময়ে সারাবিশ্বে অপরাধপ্রবণতা কমে যায়। এমন উৎসবকেও ভয় পায় কেউ কেউ। তাই মানুষের আনন্দের দিনে তারা ভয় দেখায়। ধর্মবিরোধীতার ভয়, দেশবিরোধীতার ভয়। কিন্তু যে উৎসব সকলকে মেলায়, আনন্দে ভাসায়, অপরাধ কমায় তেমন উৎসবই তো কাম্য। নির্মল আনন্দের, মানুষে মানুষে মিলনের উৎসব যত বাড়বে তত আমরা এগোতে থাকব সেই দিকে 'যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান'।

ফুটবল উৎসবে আমাদের দেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি জনতা যখন মিলিত হচ্ছে। সেই মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবারের বিশ্বকাপ আয়োজক যুদ্ধ শিরোমণি আমেরিকার শাসকরা। আয়োজকের বিনম্রতা তাদের মধ্যে নাই। আয়োজক হিসেবে আমেরিকা সকলের সমমর্যাদা নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, কোন ভাবেই তাদের আগ্রাসান ও বর্ণবাদী আচরণ আড়াল করতে পারছে না। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ মুখে গণতন্ত্রের বড় বড় কথা বললেও জবরদস্তি তার সর্বদেহ মনে।

ওমর আব্দুল কাদির আরতা। যিনি একজন সোমালিয়ান ও আফ্রিকা মহাদেশের শ্রেষ্ঠ রেফারি। ফিফা তাঁকে বিশ্বকাপে ম্যাচের জন্য মনোনীত করে। পূর্বে তিনি ছাড়পত্রও পান। কিন্তু মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা বিভাগ "যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত উদ্বেগের" কথা বলে তাঁকে আটক করে এবং দেশে প্রবেশে বাধা দেয়। ফিফা যাকে মনোনীত করছে, সামান্য অজুহাতে আমেরিকা তাঁকে আটকে দিয়েছে। একজন রেফারি, তিনি তো কোন অপরাধী নন। তবুও তাঁকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে ইংল্যান্ড ও আর্সেনালের সাবেক স্ট্রাইকার ইয়ান রাইট টুইটারে লিখেন, "প্রতি কয়েক ঘণ্টা পর পরই নতুন নতুন খবর আসছে–ভক্তদের ঢুকতে না দেওয়া, খেলোয়াড়দের ঢুকতে না দেওয়া, কর্মকর্তাদের ঢুকতে না দেওয়া, সাংবাদিকদের ঢুকতে না দেওয়া, আর এখন রেফারিদেরও।" তিনি একে "বিশৃঙ্খলার বিশ্বকাপ" বলে অভিহিত করেন। একই সাথে প্রশ্ন তোলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টের জন্য একজন আয়োজকের কি এভাবেই আচরণ করা উচিত?

সেনেগালের জাতীয় দল সান আন্তোনিওতে পৌঁছালে, মার্কিন সীমান্ত কর্মকর্তারা বিমানবন্দরের খেলোয়াড়দের জুতো খুলে, ব্যাগ খালি করে তল্লাশি করে। তাদের অজুহাত তারা 'ইবোলা' পরীক্ষা করছে। যেন খেলোয়াড়রা জুতা আর ব্যাগে করে বস্তা বস্তা 'ইবোলা' নিয়ে এসেছে!

১৫ হাজার ডলার আমানত জমা দিয়েও অফ্রিকান দেশগুলো থেকে খেলা দেখতে পারছেন না অনেকে। আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, কোত দিভোয়ার, সেনেগাল এবং তিউনিসিয়া-এই আফ্রিকান দলগুলো আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও এবারের বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে। আমেরিকার দমনমূলক নীতির কারণে দর্শক ছাড়াই তারা মাঠে নামবে। এই দলগুলো মাঠে, মাঠের বাইরে সর্বত্রই নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করছে এবং করবে। এ সব দেশের সাংবাদিকরাও ছাড়পত্র পাচ্ছেন না। যারা পাচ্ছেন, তারাও নানান হেনস্তার মুখোমুখি হচ্ছেন। অভিবাসী নীতি আর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কথা বলে এ হেনস্তা চলছে।

ইরান বৈধভাবে টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। আমেরিকা প্রবেশে নিষেদ্ধাজ্ঞা রয়েছে এমন দেশগুলোর খেলোয়াড়, কোচ এবং তাদের নিকটাত্মীয়দের একটি বিশেষ ব্যবস্থায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলেও ইরানের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মীকে ভিসা দিতে অস্বীকার করে। জাতীয় দলকে শুধুমাত্র ম্যাচের দিন দেশে প্রবেশ এবং একই দিনে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্বের জনতাকে মেলাচ্ছে আর সেই মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী।

ওষুধশিল্প ও জনগণের চিকিৎসার অধিকার:

● শেষ পৃষ্ঠার পর

বেশি মূল্যে ওষুধ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক জীবনরক্ষাকারী ওষুধ তুলনামূলক সুলভ। কারণ দেশীয় কোম্পানিগুলো জেনেরিক সংস্করণ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু কঠোর পেটেন্ট সুরক্ষা কার্যকর হলে সেই সুযোগ সংকুচিত হবে। ফলে বাজারে বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাব বাড়বে এবং ওষুধের মূল্যও বাড়বে অবশ্যম্ভাবীভাবে। এর অর্থ হলো–যে পরিবার আজ মাসে দুই হাজার টাকা খরচ করে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা চালাতে পারছে, তাকে হয়তো আগামী দিনে তিন বা চার হাজার টাকা ব্যয় করতে হবে। যে ক্যানসার রোগী কোনোভাবে চিকিৎসার খরচ জোগাড় করছেন, তার চিকিৎসা আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। যে দরিদ্র কৃষক বা শ্রমিক ঋণ নিয়ে চিকিৎসা করেন, তার জন্য চিকিৎসা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

দ্বিতীয়ত, দেশীয় ওষুধশিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বাংলাদেশের অনেক ওষুধ কোম্পানি প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করেছে মূলত জেনেরিক উৎপাদনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। দেশীয় বাজার এবং নীতিগত সহায়তার কারণে তারা টিকে থাকতে পেরেছে কিন্তু কঠোর মেধাস্বত্ব বিধান আরোপিত হলে গবেষণা, উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। এতে স্থানীয় শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে কেবল ওষুধের দামই বাড়বে না, শিল্পের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হবে। কর্মসংস্থান কমবে, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা দুর্বল হবে এবং দেশ বিদেশি করপোরেশনের ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, জনস্বাস্থ্য খাতের ওপর চাপ বাড়বে। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী এখনো ব্যক্তিগত খরচে চিকিৎসা গ্রহণ করে। চিকিৎসা খরচের প্রায় ৮০ শতাংশই রোগীদের নিজের পকেট থেকে (ব্যক্তিগতভাবে) বহন করতে হয়। সরকারি তথ্যেই উঠে এসেছে যে দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রায় ৭২ থেকে ৮০ শতাংশই সাধারণ মানুষকে নিজস্ব পকেট থেকে মেটাতে হয়। এই বিশাল খরচের বড় অংশই চলে যায় ওষুধ কেনা এবং রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষার পেছনে। এমন পরিস্থিতিতে ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি মানে শুধু রোগীর ব্যক্তিগত ব্যয় বৃদ্ধি নয়; বরং বহু মানুষ চিকিৎসা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। আজ বাংলাদেশে হাজার হাজার পরিবার চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে ঋণগ্রস্ত হচ্ছে। অনেকে জমি বিক্রি করছেন, গয়না বিক্রি করছেন, ধারদেনা করছেন। যদি ওষুধের মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই সংকট বহুগুণে বাড়বে।

চতুর্থত, স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতাও সংকুচিত হতে পারে। বহুজাতিক করপোরেশন ও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ রক্ষাকারী বাণিজ্যিক কাঠামো অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর নীতি গ্রহণের সুযোগ সীমিত করে। ফলে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র যদি বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চায়, তাও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতার মুখে পড়তে পারে।

বাংলাদেশের ওষুধশিল্প শুধু একটি শিল্পখাত নয়; এটি দেশের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি। সস্তা ও সহজলভ্য ওষুধ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই খাত কোটি মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। যখন চিকিৎসা ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন এমন কোনো চুক্তি করা উচিত নয় যা ওষুধকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলতে পারে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা করা, বহুজাতিক করপোরেশনের মুনাফা নিশ্চিত করা নয়।

বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা কি স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে দেখব, নাকি পণ্য হিসেবে?আমরা কি ওষুধকে মানুষের জীবন রক্ষার উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করব, নাকি করপোরেট মুনাফার উৎস হিসেবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি মূল্যায়নের সময় এই প্রশ্নগুলোকেই কেন্দ্রস্থলে রাখতে হবে। জনগণের চিকিৎসার অধিকার, সুলভ মূল্যে ওষুধের প্রাপ্যতা, দেশীয় ওষুধশিল্পের সুরক্ষা এবং জাতীয় নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতা–এসবের সঙ্গে আপস করে কোনো চুক্তি দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

আজ প্রয়োজন জনসম্মুখে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, চুক্তির শর্তাবলীর স্বচ্ছ প্রকাশ এবং জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। কারণ বিষয়টি কেবল অর্থনীতির নয়। বিষয়টি মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যতের। বাংলাদেশের জনগণ এমন কোনো চুক্তিকে সমর্থন করতে পারে না, যেখানে একটি বহুজাতিক করপোরেশনের মুনাফা একটি শিশুর জীবনরক্ষাকারী ওষুধের চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার। ওষুধ মানুষের অধিকার। এই অধিকার রক্ষার সংগ্রামই আজ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সংসদে চা শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে

ছবি: (ফাইল ছবি) চা শ্রমিক ঐক্যের র‍্যালী

দীর্ঘদিন ধরে চা শ্রমিকরা দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরির দাবিতে আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলনকে নানা সময় মালিকপক্ষ ও সরকার অযৌক্তিক এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস বলে প্রচার করেছে। আজকে জাতীয় সংসদে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা করার বিষয়ে আলাপ তুলেছেন একজন সংসদ সদস্য। সংসদে মজুরি সংক্রান্ত এই আলোচনা আমাদের উত্থাপিত দাবি ও চা শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের যৌক্তিকতাকেই প্রতিষ্ঠা করে।

বাস্তবে দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার ফলেই আজকে সংসদে মজুরি সংক্রান্ত বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সংসদে আলোচনা মানেই ৫০০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি নয়। শ্রমমন্ত্রী বলেছেন আগস্টে সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের আলোচনার মাধ্যমে এই মজুরি নির্ধারিত হবে। এর প্রেক্ষিতে যে সংসদ সদস্য দাবি তুলেছিলেন, তিনি তার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন।

আমরা আশা করি, আগামীতে মজুরি সংক্রান্ত বৈঠকে ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরির দাবিটি কার্যকর করতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। সংসদের আলোচনা যেন শুধু সংসদের আলোচনা হিসেবেই থেকে না যায়। শুধু মজুরি নয়, ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ চা শ্রমিকদের মৌলিক ও মানবিক অধিকার নিশ্চিতের দাবি জানাচ্ছি।

আমরা চা শ্রমিকদের আহ্বান জানাব, সংসদে যে আলোচনাই হোক না কেন, তা বাস্তবায়ন হবে কি না, তা নির্ভর করে রাজপথের আন্দোলনের ওপর। রাজপথে আন্দোলনের শক্তি অনুপস্থিত হলে মজুরি কেন, কোনো দাবিই বাস্তবায়িত হবে না। ফলে রাজপথই চা শ্রমিকদের একমাত্র ভরসা।

আমরা একই সাথে চা শ্রমিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। মজুরি সংক্রান্ত আলোচনার এই ডামাডোলের মধ্যে যাতে চা শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী অন্য কোনো প্রকল্প চালু না হয়। অতীতে আমরা দেখেছি, চা শ্রমিকদের এক আলোচনায় আটকে রেখে অন্য বিষয় কার্যকর করা হয়েছে। আন্দোলনের ফলে সরকার ৫০ টাকা মজুরি বাড়ালেও, গোপনে চা শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী গেজেট কার্যকর করা হয়েছে। ফলে সতর্কতা ও আন্দোলন জরুরি।

সাম্যবাদ

১৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০২৬

সাম্যবাদ-এর ফেসবুক পেইজ ফলো করতে স্ক্যান করুন

মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি

ওষুধশিল্প ও জনগণের চিকিৎসার অধিকার: বাংলাদেশের সামনে নতুন সংকট

বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির শর্তগুলো যতই প্রকাশ্যে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে এই চুক্তির প্রশ্ন কেবল শুল্ক, রপ্তানি বা বিনিয়োগের প্রশ্ন নয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, শিল্পের ভবিষ্যৎ, কৃষির টিকে থাকা এবং সর্বোপরি জনগণের মৌলিক অধিকারগুলোর সঙ্গে জড়িত একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। বিশেষ করে ওষুধশিল্প ও চিকিৎসা সেবার ওপর সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়টি গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

সরকারি প্রচারণায় বলা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাংলাদেশের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্য ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে দুর্বল ও নির্ভরশীল অর্থনীতির দেশগুলোর বাণিজ্য চুক্তি সবসময় সমান সুবিধা নিশ্চিত করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এসব চুক্তি স্থানীয় শিল্প, কৃষি, শ্রম অধিকার এবং জনকল্যাণমূলক খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। লাতিন আমেরিকা থেকে আফ্রিকা, এশিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপ – অসংখ্য দেশের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে তথাকথিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি প্রায়শই দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর বাজারকে বহুজাতিক করপোরেশনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, স্থানীয় উৎপাদনকে দুর্বল করে এবং জনগণের অধিকারকে মুনাফার অধীনস্থ করে ফেলে।

বিশেষত ওষুধশিল্প ও জনগণের চিকিৎসা অধিকার নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র বা ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে মানুষ হয়তো বিকল্প খুঁজে নিতে পারে, কিন্তু ক্যানসারের রোগী, কিডনি রোগী, হৃদরোগী কিংবা ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের সামনে এমন কোনো বিকল্প থাকে না। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার ওষুধ তার কাছে বিলাসিতা নয়, বেঁচে থাকার শর্ত। অথচ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ ক্রমশ মুনাফাভিত্তিক বাজারের নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। বাণিজ্য চুক্তির শর্তগুলোতেও বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, এর ফলে সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হবে দেশের সাধারণ জনগণকে।

বাংলাদেশের ওষুধশিল্প স্বাধীনতার পর দীর্ঘ চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার অধিকাংশ ওষুধ দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই উৎপাদন করে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বহু দেশেও বাংলাদেশি ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। এর পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব ব্যবস্থার কিছু বিশেষ সুবিধা, যা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভোগ করে আসছে। এই সুবিধার কারণে অনেক জীবনরক্ষাকারী ওষুধ তুলনামূলক কম দামে উৎপাদন ও বাজারজাত করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় কঠোর মেধাস্বত্ব সুরক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছে। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা পেটেন্টের মেয়াদ বৃদ্ধি, তথ্য সুরক্ষা এবং বাজারে জেনেরিক ওষুধের প্রবেশে অতিরিক্ত বাধা আরোপের মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়। বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে এ ধরনের শর্ত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ফলে দেশীয় ওষুধশিল্পের জন্য তা বড় ধরনের চাপ তৈরি করতে পারে।

প্রথমত, বাজারে প্রতিযোগিতা থাকলে দাম কমে। কিন্তু যখন একটি কোম্পানি কোনো ওষুধের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন দাম বৃদ্ধি প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশ্বজুড়ে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ক্যানসার, এইডস, হেপাটাইটিস এবং বিরল রোগের ওষুধের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বহু বছর ধরে বিপুল মুনাফা করেছে।

এমনকি অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যয়ের তুলনায় শতগুণ পর্যন্ত

● এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

র‍্যাবের নাম বদলে স্পেশাল রেসপন্স টিম:

সংস্কারের পরিবর্তে নিপীড়নকারী সংস্থার পুনর্গঠন

২০০৪ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) গঠিত হয়। সন্ত্রাস ও অপরাধ দমনের কথা বলে গঠিত এই বিশেষ বাহিনী অল্প সময়ের মধ্যেই 'ক্রসফায়ার' ও 'বন্দুকযুদ্ধ' -এর মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে। আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে মানুষ হত্যার যে সংস্কৃতি পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার অংশ হয়ে ওঠে, র‍্যাব তার অন্যতম প্রধান বাহক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

র‍্যাব গঠনের পর থেকেই মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উত্থাপন করে আসছিল। কিন্তু এসব অভিযোগ সত্ত্বেও বাহিনীটির কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। রাষ্ট্রের প্রচলিত বিচারব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা কাঠামোর সীমাবদ্ধতা দূর করার পরিবর্তে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বাহিনীর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো হয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে র‍্যাবের ভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়। এই সময়ে গুম, নির্যাতন ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের অসংখ্য অভিযোগ সামনে আসে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী, ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তি, শ্রমিকনেতা, ছাত্রনেতা ও অধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নানা অভিযানে র‍্যাবের নাম বারবার উঠে আসে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আন্তর্জাতিক মহলেও বাহিনীটি সমালোচিত হয়। ফলে র‍্যাব অপরাধ দমনকারী বাহিনী হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় জনগণের সামনে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নটি নতুনভাবে উত্থাপিত হয়। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিভিন্ন দমনমূলক কাঠামোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে র‍্যাব বিলুপ্তির দাবি ছিল অন্যতম আলোচিত দাবি। একই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের গণতান্ত্রিক সংস্কার, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ এবং মানবাধিকার সুরক্ষার প্রশ্নও সামনে আসে। দাবি ছিল, যে কাঠামো জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটির মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

কিন্তু সেই দাবি বাস্তবায়নের পরিবর্তে এখন র‍্যাবের পরিবর্তে 'স্পেশাল রেসপন্স টিম' গঠনের উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী এটি হবে নতুন ধরনের বিশেষ বাহিনী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাহিনীর নাম পরিবর্তন করলেই কি তার চরিত্র পরিবর্তিত হয়? যে বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা, সীমিত জবাবদিহিতা এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, সেই একই ধরনের কাঠামো নতুন নামে প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের অভিজ্ঞতায় কতটা পরিবর্তন আসবে?

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতার রাজনৈতিক ব্যবহারের ঝুঁকি বহন করে। ক্ষমতাসীন শক্তি পরিবর্তিত হলেও সেই ঝুঁকি থেকে যায়। অতীতে বিএনপি সরকারের আমলে গঠিত র‍্যাব আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সমস্যা কোনো নির্দিষ্ট দলের নয়; সমস্যা হলো এমন একটি কাঠামো, যা জনগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার বাইরে অবস্থান করে।

গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের সংস্কার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু যদি সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি বিতর্কিত অংশকে নতুন নামে পুনর্গঠন করা হয়, তাহলে তা সংস্কারের চেয়ে ধারাবাহিকতার ইঙ্গিতই বেশি বহন করে। র‍্যাবের পরিবর্তে স্পেশাল রেসপন্স টিম গঠনের উদ্যোগ তাই কেবল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি রাষ্ট্র কোন পথে এগোতে চায়, সেই প্রশ্নের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই প্রশ্ন রয়ে যায় – নতুন নামে আরেকটি বিশেষ বাহিনী প্রয়োজন নাকি প্রয়োজন এমন একটি আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা, যা জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে, আইনের শাসন মেনে চলবে এবং নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে?

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে রৌমারীতে বিক্ষোভ

রৌমারী, রাজিবপুর ও দেওয়ানগঞ্জে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, লোডশেডিং ও লোভোল্টেজ রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে 'বিদ্যুত গ্রাহক সংগ্রাম কমিটি' রৌমারী উপজেলা শাখার উদ্যোগে গত ৫ জুলাই '২৬ রৌমারী উপজেলা চত্বরে সমাবেশ ও বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সমাবেশে কমিটির সংগঠক মহীউদ্দীন আহমেদ মহিরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মহীউদ্দীন আহমেদ, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য রাজু আহমেদ, রৌমারী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান, বিদ্যুৎ গ্রাহক খায়রুন্নেসা সরকার, ফিরোজ আহমেদ, শহীদুল্লাহ্ কায়সার লেবু প্রমুখ।

মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে জবি ছাত্র ফ্রন্টের পলিসি ডিবেট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গত ২৫ জুন শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে 'এই সংসদ মনে করে, ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির সময়কালেই, বাংলাদেশ নব নির্বাচিত সরকারের উচিত মার্কিন চুক্তি সম্পূর্ণ বাতিল করা'- শীর্ষক পলিসি ডিবেট অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আয়োজন সঞ্চালনা করেন সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইভান তাহসীব। মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক ও গবেষক মাহা মীর্জা। এছাড়াও প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গনতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য মাহতাব উদ্দিন আহমেদ এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ।

সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবসে শহীদ সিধু-কানু'র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভা

৩০ জুন ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবসের বীর শহীদ সিধু-কানুর প্রতি বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নের গাংরাইল গ্রামে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। একই সাথে পাঁচবিবি উপজেলার ধরনজী ইউনিয়নের নুন্দইল গ্রামেও আদিবাসী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য একরামুল হক, পাঁচবিবি উপজেলার আহবায়ক জহুরুল ইসলাম, রুপাপুর গ্রামের সংগঠক নরেশ কিসপট্টরা, গাংরাইল গ্রাম কমিটির আহবায়ক কালীচরণ তির্কী, সাধারণ সম্পাদক বিমল টপ্পো, সদস্য ভুপেন উড়াও সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩, ০১৭১১-৪৪০২৬৫। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org